সূরা ১ ঃ ফাতিহা, মাক্কী

(আয়াত ঃ ৭, রুকূ' ঃ ১)

سُوْرَةُ الْفاتِحَة مَاكِّ

(اٰيَاتُهَا : ٧. رُكُوْعَاتُهَا : ١)

'ফাতিহা' শব্দের অর্থ এবং এর বিভিন্ন নাম

এই সূরাটির নাম 'সূরা আল্ ফাতিহা। কোন কিছু আরম্ভ করার নাম 'ফাতিহা' বা উদ্‌ঘাটিকা। কুরআনুল হাকীমের প্রথমে এই সূরাটি লিখিত হয়েছে বলে একে 'সূরা আল ফাতিহা বলা হয়। তাছাড়া সালাতের মধ্যে এর দ্বারাই কিরা'আত আরম্ভ করা হয় বলেও একে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'উম্মুল কিতাব'ও এর অপর একটি নাম। জামহুর বা অধিকাংশ ইমামগণ এ মতই পোষণ করে থাকেন। তিরমিযীর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

এই সূরাটি হল উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবআ' মাসানী এবং কুরআন আযীম'। এই সূরাটির নাম 'সূরাতুল হামদ' এবং 'সূরাতুস্ সালাত'ও বটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি সালাতকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার মধ্যে এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দিয়েছি। যখন বান্দা বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।' (তিরমিযী ৮/২৮৩) এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরা ফাতিহার নাম সূরা-ই-সালাতও বটে। কেননা এই সূরাটি সালাতের মধ্যে পাঠ করা শর্ত রয়েছে। এই সূরার আর একটি নাম সূরাতুশ্ শিফা। এর আর একটি নাম 'সূরাতুর রুকিয়্যাহ'। আবূ সাঈদ (রাঃ) সাপে কাটা রুগীর উপর ফুঁ দিলে সে ভাল হয়ে যায়। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

'এটা যে রুকিয়্যাহ (অর্থাৎ পড়ে ফুঁক দেয়ার সূরা) তা তুমি কেমন করে জানলে?' (ফাতহুল বারী ৪/৫২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবুল আলীয়া (রহঃ) বলেন যে, এই সূরাটি মাক্কী। কেননা এক আয়াতে আছে ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ

আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮৭) আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ফাতিহায় আয়াত, শব্দ ও অক্ষরের সংখ্যা

এ সূরার আয়াত সম্পর্কে সবাই একমত যে ওগুলি ৭টি। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ এই সূরাটির পৃথক আয়াত কিনা তাতে মতভেদ রয়েছে। সমস্ত কারী, সাহাবী (রাঃ) এবং তাবেঈর (রহঃ) একটি বিরাট দল এবং পরবর্তী যুগের অনেক বয়োবৃদ্ধ মুরব্বী একে সূরা ফাতিহার প্রথম, পূর্ণ একটি পৃথক আয়াত বলে থাকেন। এই সূরাটির শব্দ হল পঁচিশটি এবং অক্ষর হল একশো তেরটি।

সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কিতাব বলার কারণ

ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীর 'কিতাবুত্ তাফসীরে' লিখেছেন ঃ 'এই সূরাটির নাম উম্মুল কিতাব' রাখার কারণ এই যে, কুরআন মাজীদের লিখন এ সূরা হতেই আরম্ভ হয়ে থাকে এবং সালাতের কিরা'আতও এ থেকেই শুরু হয়। (ফাতহুল বারী ৮/৬)

একটি অভিমত এও আছে যে, যেহেতু পূর্ণ কুরআনুল হাকীমের বিষয়াবলী সংক্ষিপ্তভাবে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সেহেতু এর নাম উম্মুল কিতাব হয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ আরাব দেশের মধ্যে এ প্রথা চালু আছে যে, তারা একটি ব্যাপক কাজ বা কাজের মূলকে ওর অধীনস্থ শাখাগুলির 'উম্ম' বা 'মা' বলে থাকে। যেমন أُمُّ الرَّاسِ তারা ঐ চামড়াকে বলে যা সম্পূর্ণ মাথাকে ঘিরে রয়েছে এবং সামরিক বাহিনীর পতাকাকেও তারা أُمٌّ বলে থাকে যার নীচে জনগণ একত্রিত হয়। মাক্কাকেও উম্মুল কুরা বলার কারণ এই যে, ওটাই সারা বিশ্ব জাহানের প্রথম ঘর। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবী সেখান হতেই ব্যাপ্তি ও বিস্তার লাভ করেছে। (তাবারী ১/১০৭) মুসনাদ আহমাদে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উম্মুল কুরা' সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'এটাই 'উম্মুল কুরআন' এটাই 'সাবআ' মাসানী' এবং এটাই কুরআনুল আযীম।' (আহমাদ ২/৪৪৮) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইহাই 'উম্মুল কুরআন,' ইহাই 'ফাতিহাতুল কিতাব' এবং ইহাই 'সাবআ' মাসানী।' (তাবারী ১/১০৭)

সূরা ফাতিহার ফাযীলাত

মুসনাদ আহমাদে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমি সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডাক দিলেন, আমি কোন উত্তর দিলাম না। সালাত শেষ করে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ এতক্ষণ তুমি কি কাজ করছিলে?' আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সালাত আদায় করছিলাম।' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ কি তুমি শুননি?

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারের দিকে আহ্বান করেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪) মাসজিদ হতে যাবার পূর্বেই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরা কোন্‌টি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে মাসজিদ হতে চলে যাবার ইচ্ছা করলে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ 'ঐ সূরাটি হল 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। এটাই সাবআ' মাসানী এবং এটাই কুরআন আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।' (আহমাদ ৪/২১১) এভাবেই এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং ইব্‌ন মাজাহয়ও অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ৮/৬, ২৭১; ২/১৫০, ২/১৩৯ এবং ২/১২৪৪) মুসনাদ আহমাদে আরও রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্‌ন কা'বের (রাঃ) নিকট যান যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে উবাই (রাঃ)! এতে তিনি (তাঁর ডাকের প্রতি) মনোযোগ দেন কিন্তু কোন উত্তর দেননি। আবার তিনি বলেন ঃ 'হে উবাই!' তিনি বলেন ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'ওয়া আলাইকাস সালাম।' তারপর বলেন ঃ 'হে উবাই! আমি তোমাকে ডাক দিলে উত্তর দাওনি কেন?' তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সালাত আদায় করছিলাম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করে বলেন ঃ

'তুমি কি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ এই আয়াতটি শুননি?'

তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ (আমি শুনেছি), এরূপ কাজ আর আমার দ্বারা হবেনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ

'তুমি কি চাও যে, তোমাকে আমি এমন একটি সূরার কথা বলি যার মত কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনে নেই? তিনি বলেন ঃ 'হ্যাঁ অবশ্যই বলুন।' তিনি বলেন ঃ এখান থেকে যাবার পূর্বেই আমি তোমাকে তা বলে দিব।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে চলতে চলতে অন্য কথা বলতে থাকেন, আর আমি ধীর গতিতে চলতে থাকি। এই ভয়ে যে না জানি কথা বলা বাকি থেকে যায়, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাড়ীতে পৌঁছে যান। অবশেষে দরজার নিকট পৌঁছে আমি তাঁকে তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেই।' তিনি বললেন ঃ 'সালাতে কি পাঠ কর?' আমি উম্মুল কুরা' পাঠ করে শুনিয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ

'সেই আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এরূপ কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুরের মধ্যে নেই যা কুরআনে রয়েছে। এটাই হল 'সাবআ' মাসানী'। (আহমাদ ২/৪১২, তিরমিযী ৮/২৮৩, হাকিম ১/৫৬০) জামে'উত তিরমিযীতে আরও একটু বেশি বর্ণিত আছে। তা হল এই ঃ

'এটাই মহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে।' এই হাদীসটি সংজ্ঞা ও পরিভাষা অনুযায়ী হাসান ও সহীহ। আনাস (রাঃ) হতেও এ অধ্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মুসনাদ আহমাদেও এভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে পরিভাষার প্রেক্ষিতে হাসান গারীব বলে থাকেন। মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। সে সময় সবেমাত্র তিনি সৌচক্রিয়া সম্পাদন করেছেন। আমি তিনবার সালাম দেই, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেননা। তিনি বাড়ীর মধ্যেই চলে গেলেন। আমি দুঃখিত ও মর্মাহত অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করি। অল্পক্ষণ পরেই পবিত্র হয়ে তিনি আগমন করেন এবং তিনবার সালামের জবাব দেন। অতঃপর বলেন, 'হে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যাবির! জেনে রেখ, সম্পূর্ণ কুরআনের মধ্যে সর্বোত্তম সূরা হল الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এই সূরাটি। (আহমাদ ৪/১৭৭, মুআত্তা ১/৮৪) এর ইসনাদ খুব চমৎকার।

সূরা ফাতিহার মর্যাদার ব্যাপারে উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ছাড়াও আরও হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'একবার আমরা সফরে ছিলাম। এক স্থানে আমরা অবতরণ করি। হঠাৎ একটি দাসী এসে বলল ঃ 'এ এলাকার গোত্রের নেতাকে সাপে কেটেছে। আমাদের লোকেরা এখন সবাই অনুপস্থিত। ঝাড় ফুঁক দিতে পারে এমন কেহ আপনাদের মধ্যে আছে কি? আমাদের মধ্য হতে একটি লোক তার সাথে গেল। সে যে ঝাড় ফুঁকও জানত তা আমরা জানতামনা। সেখানে গিয়ে সে কিছু ঝাড় ফুঁক করল। আল্লাহর অপার মহিমায় তৎক্ষণাৎ সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করল। অতঃপর সে ৩০টি ছাগী দিল এবং আমাদের আতিথেয়তার জন্য অনেক দুধও পাঠিয়ে দিল। সে ফিরে এলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমার কি এ বিদ্যা জানা ছিল?' সে বলল ঃ 'আমিতো শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়েছি।' আমরা বললাম ঃ 'তাহলে এ প্রাপ্ত মাল এখনই স্পর্শ করনা। প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে নেই।' মাদীনায় এসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ 'এটা যে ফুঁক দেয়ার সূরা তা সে কি করে জানল? এ মাল ভাগ কর। আমার জন্যও এক ভাগ রেখ।' (ফাতহুল বারী ৮/৬৭১)

সহীহ মুসলিম ও সুনান নাসাঈতে আছে যে, একদা জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসেছিলেন, এমন সময় উপর হতে এক বিকট শব্দ এলো। জিবরাঈল (আঃ) উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আজ আকাশের ঐ দরজাটি খুলে গেছে যা ইতোপূর্বে কখনও খুলেনি। অতঃপর সেখান হতে একজন মালাক/ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'আপনি খুশি হোন! এমন দু'টি নূর আপনাকে দেয়া হল যা ইতোপূর্বে কেহকেও দেয়া হয়নি। তা হল সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারাহর শেষ আয়াতগুলি। ওর এক একটি অক্ষরের উপর নূর রয়েছে।' এটি সুনান নাসাঈর শব্দ।

সূরা ফাতিহা ও সালাত আদায় প্রসঙ্গ

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি সালাতে উম্মুল কুরআন পড়ল না তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, পূর্ণ নয়।' আবূ হুরাইরাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'আমরা যদি

ইমামের পিছনে থাকি তাহলে? তিনি বললেন ঃ 'তাহলেও চুপে চুপে পড়ে নিও।' আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি, তিনি বলতেন ঃ

'আল্লাহ ঘোষণা করেন ঃ 'আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধ অর্ধ করে ভাগ করেছি এবং আমার বান্দা আমার কাছে যা চায় তা আমি তাকে দিয়ে থাকি। যখন বান্দা বলে, الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' বান্দা যখন বলে, الرَّحْمَـــنِ الرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, مَـــلِكِ يَوْمِ الدِّين তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করল।' কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার উপর (সবকিছু) সর্মপণ করল।' যখন বান্দা বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের কথা এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা চাবে আমি তাকে তাই দিব' অতঃপর বান্দা যখন اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

'এসব আমার বান্দার জন্য এবং সে যা কিছু চাইল তা সবই তার জন্য।' (মুসলিম ১/২৯৬, নাসাঈ ৫/১১, ১২) কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় শব্দগুলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

আলোচ্য হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা

এখন এই হাদীসের উপকারিতা ও লাভালাভ লক্ষ্যণীয় বিষয়। প্রথমতঃ এই হাদীসের মধ্যে صَلَوةٌ অর্থাৎ সালাতের সংযোজন রয়েছে এবং তার তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছে কিরা'আত। যেমন কুরআনের মধ্যে অন্যান্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

তোমরা সালাতে তোমাদের স্বর উচু করনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করনা; এই দুই এর মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০) এর তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'সালাওয়াত' শব্দের

অর্থ হল কিরা'আত বা কুরআন পঠন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫৭) এভাবে উপরোক্ত হাদীসে কিরা'আতকে 'সালাত' বলা হয়েছে। এতে সালাতের মধ্যে কিরা'আতের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বিলক্ষণ জানা যাচ্ছে। আরও প্রকাশ থাকে যে, কিরা'আত সালাতের একটি মস্তবড় স্তম্ভ। এ জন্যই এককভাবে ইবাদাতের নাম নিয়ে ওর একটি অংশ অর্থাৎ কিরা'আতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অপর পক্ষে এমনও হয়েছে যে, এককভাবে কিরা'আতের নাম নিয়ে তার অর্থ সালাত নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা ঃ

وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

কারণ ফাজরের কুরআন পাঠ স্বাক্ষী স্বরূপ। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৭৮) এখানে কুরআনের ভাবার্থ হল সালাত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, ফাজরের সালাতের সময় রাত্রি ও দিনের মালাইকা/ফেরেশতাগণ একত্রিত হন। (ফাতহুল বারী ৮/২৫১, মুসলিম ১/৪৩৯)

প্রতি রাক'আতে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, সালাতে কিরা'আত পাঠ খুবই যরুরী এবং আলেমগণও এ বিষয়ে একমত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে যে, সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যরুরী এবং অপরিহার্য এবং তা পড়া ছাড়া সালাত আদায় হয়না। অন্যান্য সমস্ত ইমামের এটাই মত। এই হাদীসটি তাঁদের দলীল যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল, অথচ তাতে উম্মুল কুরআন পাঠ করলনা, ঐ সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ; পূর্ণ নয়'। (আহমাদ ২/২৫০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা তার সালাত হয়না।' (ফাতহুল বারী ২/২৭৬, মুসলিম ১/২৯৫) সহীহ ইব্‌ন খুযাইমাহ্ ও সহীহ ইব্‌ন হিব্বানে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ সালাত হয়না যার মধ্যে উম্মুল কুরআন পড়া না হয়।" (হাদীস নং ১/২৪৮ ও ৩/১৩৯) এ ছাড়া আরও বহু হাদীস রয়েছে যে, প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

ইসতি'আযাহ বা আ'উযুবিল্লাহ প্রসঙ্গ

পবিত্র কুরআনে রয়েছে ঃ

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯৯-২০০) অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

মন্দকে প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৪-৩৬)

এ মর্মে এই তিনটিই আয়াত আছে এবং এই অর্থের অন্য কোন আয়াত নেই। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মানুষের শত্রুতার সবচেয়ে ভাল ঔষধ হল প্রতিদানে তাদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা।

এরূপ করলে তারা তখন শত্রুতা করা থেকেই বিরত থাকবেননা, বরং অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হবে। আর শাইতানদের শত্রুতা হতে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে বলেন। কারণ সে মানুষের বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পায়। তার পুরাতন শত্রুতা হাওয়া ও আদমের (আঃ) সময় হতেই অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ

'হে আদমসন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কার করেছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২৭) অন্য স্থানে বলা হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬)

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০) এতো সেই শাইতান যে আমাদের আদি পিতা আদমকে (আঃ) বলেছিল ঃ 'আমি তোমার একান্ত শুভাকাংখী।' তাহলে চিন্তার বিষয় যে, আমাদের সঙ্গে তার চালচলন কি হতে পারে? আমাদের জন্যই তো সে শপথ করে বলেছিল ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ

সে বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮২-৮৩) এ জন্য মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ. إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৮-১০০) ঈমানদারগণ ও প্রভুর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের উপর তার কোন ক্ষমতাই নেই। তার ক্ষমতা তো শুধু তাদের উপরই রয়েছে যারা তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শির্ক করে।

কুরআন তিলাওয়াত করার আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ

যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৯৮) তিনি আরও বলেন ঃ

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশে দন্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলিকে ধুয়ে নাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬)

জামহুর উলামার প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, কুরআন পাঠের পূর্বে আ'উযুবিল্লাহ' পাঠ করা উচিত, তাহলে কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। সুতরাং ঐ বুযুর্গদের নিকট আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ 'যখন তুমি পড়বে' অর্থাৎ তুমি পড়ার ইচ্ছা করবে। যেমন নিম্নের আয়াতটি ঃ

'যখন তুমি সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়াও' (তাহলে ওযূ করে নাও) এর অর্থ হল ঃ 'যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়ানোর ইচ্ছা কর।' হাদীসগুলির ধারা অনুসারেও এই অর্থটিই সঠিক বলে মনে হয়। মুসনাদ আহমাদের হাদীসে আছে

যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে সালাত আরম্ভ করতেন, অতঃপর

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

তিনবার পড়ে **لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ** পড়তেন। তারপর পড়তেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْثِهِ.

সুনান আরবায়ও এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এই অধ্যায়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীস এটাই। (আহমাদ ৩/৬৯, আবূ দাঊদ ১/৪৯০, তিরমিযী ২/৪৭, নাসাঈ ২/১৩২) ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) স্বীয় সুনানে এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। (ইব্ন মাজাহ ১/২৬৫) আবূ দাঊদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে প্রবেশ করেই তিনবার 'আল্লাহু আকবার কাবীরা' তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ কাসীরা' এবং তিনবার 'সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা' পাঠ করতেন। অতঃপর পড়তেন। **اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَ نَفْخِهِ وَ نَفْثِهِ.** (আবূ দাঊদ ১/৪৮৬)

সুনান ইব্ন মাজাহয়ও অন্য সনদে এই হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। (হাদীস নং ১/২৬৬)

রাগান্বিত হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে

মুসনাদ আবি ইয়ালায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দু'টি লোকের ঝগড়া বেধে যায়। ক্রোধে একজনের নাসারন্ধ্র ফুলে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'লোকটি যদি **أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ** পড়ে নেয় তাহলে তার ক্রোধ এখনই ঠাণ্ডা ও স্তিমিত হয়ে যাবে।' ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় কিতাব **اَلْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ** এর মধ্যেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, সুলাইমান ইব্ন সূরার বলেছেন ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় দুই লোক তর্ক করছিল। তাদের একজন অপরজনকে গালাগালি করছিল এবং রাগে তার মুখমন্ডল রক্তিমাভ হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা এখন উচ্চারণ করে তাহলে তার রাগান্বিত অবস্থা চলে যাবে। তা হল আ’উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বলা। তখন ঐ লোককে অন্যরা বললেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা কি তুমি শুনতে পাওনি? লোকটি বলল ঃ আমি পাগল নই। (ফাতহুল বারী ৬/৩৮৮, মুসলিম ৪/২০১৫, আবূ দাঊদ ৫/১৪০, নাসাঈ ১০২৩৩)

সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ এবং সুনান নাসাঈতেও বিভিন্ন সনদে এবং বিভিন্ন শব্দে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও হাদীস রয়েছে। এ সবের বর্ণনার জন্য যিক্‌র, ওযীফা এবং আমলের বহু কিতাব রয়েছে।

ইসতি‘আযাহ কি যরুরী

জামহুর উলামার মতে ‘ইসতি‘আযাহ্’ বা ‘আঊযুবিল্লাহ’ পড়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। সুতরাং তা না পড়লে পাপ হবেনা। ‘আতা ইব্‌ন আবী রিবাহের (রহঃ) অভিমত এই যে, কুরআন পাঠের সময় আ’ঊযু পড়া ওয়াজিব, তা সালাতের মধ্যেই হোক বা সালাতের বাইরেই হোক। ইমাম রাযী (রহঃ) এই কথাটি নকল করেছেন। ‘আতার (রহঃ) কথার দলীল প্রমাণ হল আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলি। কেননা এতে فَاسْتَعِذْ শব্দটি ‘আমর’ বা নির্দেশ সূচক ক্রিয়াপদ। ঠিক তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সদা সর্বদা এর উপর আমলও তা অবশ্য করণীয় হওয়ার দলীল। এর দ্বারা শাইতানের দুষ্টামি ও দুস্কৃতি দূর হয় এবং তা দূর করাও এক রূপ ওয়াজিব। আর যা দ্বারা ওয়াজিব পূর্ণ হয় সেটাও ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়।

আ‘উযুবিল্লাহ বলার ফাযীলাত

আ’ঊযুবিল্লাহির মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর উপকার ও মাহাত্ম্য। আজে বাজে কথা বলার ফলে মুখে যে অপবিত্রতা আসে তা বিদূরিত হয়। ঠিক তদ্রূপ এর দ্বারা মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁর ব্যাপক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয়। আর আধ্যাত্মিক প্রকাশ্য শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় দুর্বলতা ও অপারগতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়। কেননা মানুষ শত্রুর

মুকাবিলা করা যায়। অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা তার শত্রুতা দূর করা যায়। যেমন পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতগুলিতে রয়েছে যেগুলি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا

নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ৬৫)' যে মুসলিম কাফিরের হাতে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি শহীদ হন। যে সেই গোপনীয় শত্রু শাইতানের হাতে মারা পড়ে সে আল্লাহর দরবার থেকে হবে বহিষ্কৃত, বিতাড়িত। মুসলিমের উপর কাফিরেরা জয়যুক্ত হলে মুসলিম প্রতিদান পেয়ে থাকেন। কিন্তু যার উপর শাইতান জয়যুক্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। শাইতান মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ শাইতানকে দেখতে পায়না বলে কুরআনুল হাকীমের শিক্ষা হল ঃ 'তোমরা তার অনিষ্ট হতে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর যিনি তাকে (শাইতানকে) দেখতে পান, কিন্তু সে তাঁকে দেখতে পায়না।

আ'উযুবিল্লাহর নিগূঢ় তত্ত্ব

আ'ঊযুবিল্লাহ পড়া হল আল্লাহ তা'আলার নিকট বিনীত হয়ে প্রার্থনা করা এবং প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্টতা হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া। **عَيَاذُه** এর অর্থ হল অনিষ্টতা দূর করা, আর **اَيَاذُه** এর অর্থ হল মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করা।

'আ'ঊযু' এর অর্থ হল এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যেন বিতাড়িত শাইতান ইহজগতে ও পরজগতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে। যে নির্দেশাবলী পালনের জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি তা পালনে যেন আমি বিরত না হয়ে পড়ি। আবার যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন আমি না করি। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, শাইতানের অনিষ্টতা হতে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কেহ রক্ষা করতে পারেনা। এ জন্য বিশ্ব প্রভু আল্লাহ মানুষরূপী শাইতানের দুষ্কার্য ও অন্যায় হতে নিরাপত্তা লাভ করার যে পন্থা শিখালেন তা হল তাদের সঙ্গে সদাচরণ। কিন্তু জিন রূপী শাইতানের দুষ্টামি ও দুষ্কৃতি হতে রক্ষা পাওয়ার যে উপায় তিনি বলে দিলেন তা হল তাঁর স্মরণে আশ্রয় প্রার্থনা। কেননা না তাকে ঘুষ দেয়া যায়, না তার সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে সে দুষ্টামি হতে বিরত হয়। তার অনিষ্টতা হতে তো বাঁচাতে পারেন একমাত্র

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত। প্রাথমিক তিনটি আয়াতে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে। সূরা আরাফে আছে ঃ

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৯৯) ইহা হল মানুষের সাথে ব্যবহার সংক্রান্ত। অতঃপর একই সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০০) সূরা মু'মিনূনে রয়েছে ঃ

ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮)

এই তিনটি আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা ও অনুবাদ ইতোপূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তির আর তেমন প্রয়োজন নেই। অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয়

শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৪১ ঃ ৩৪-৩৬)

শাইতান শব্দটির আভিধানিক বিশ্লেষণ

আরাবী ভাষার অভিধানে **شَيْطَان** শব্দটি **شَطَنٌ** থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হল দূরত্ব। যেহেতু এই মারদুদ ও অভিশপ্ত শাইতান প্রকৃতগতভাবে মানব প্রকৃতি হতে দূরে রয়েছে, বরং নিজের দুষ্কৃতির কারণে প্রত্যেক মঙ্গল ও কল্যাণ হতে দূরে আছে, তাই তাকে শাইতান বলা হয়। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা **شَاطَ** হতে গঠিত হয়েছে। কেননা সে আগুন হতে সৃষ্টি হয়েছে এবং **شَاطَ** এর অর্থ এটাই। কেহ কেহ বলেন যে, অর্থের দিক দিয়ে দুটোই ঠিক। কিন্তু প্রথমটিই বিশুদ্ধতর। আরাব কবিদের কবিতার মধ্যে এর সত্যতা প্রমাণিত হয় সর্বতোভাবে।

কবি সীবাওয়াইর উক্তি আছে যে, যখন কেহ শাইতানী কাজ করে তখন আরাবেরা বলে ঃ **تَشَيْطَنَ فُلاَنٌ** কিন্তু **تَشَيَّطَ فُلاَنٌ** বলেনা। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ শব্দটি **شَاطَ** হতে নয়, বরং **شَطَنٌ** হতেই নেয়া হয়েছে। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে দূরত্ব। কোন জিন, মানুষ বা চতুস্পদ প্রাণী দুষ্টামি করলে তাকে শাইতান বলা হয়। কুরআনুম মাজীদে রয়েছে ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا

আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণামূলক কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১২) মুসনাদ আহমাদে আবূ যার (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ

'হে আবূ যার! দানব ও মানব শাইতান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।' আমি বলি, মানুষের মধ্যেও কি শাইতান আছে? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ'। (আহমাদ ৫/১৭৮) সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'মহিলা, গাধা এবং কালো কুকুর সালাত নষ্ট করে দেয়।' তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! লাল, হলদে কুকুর হতে কালো কুকুরকে স্বতন্ত্র করার কারণ কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কালো কুকুর শাইতান।' (মুসলিম ১/৩৬৫)

যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন ঃ 'উমার (রাঃ) একবার তুর্কী ঘোড়ার উপরে আরোহণ করেন। ঘোড়াটি সগর্বে চলতে থাকে। উমার (রাঃ) ঘোড়াটিকে মারপিটও করতে থাকেন। কিন্তু ওর সদর্প চাল আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি নেমে পড়েন এবং বলেন ঃ 'আমার আরোহণের জন্য তুমি কোন্ শাইতানকে ধরে এনেছ! আমার মনে অহংকারের ভাব এসে গেছে। সুতরাং আমি ওর পৃষ্ঠ হতে নেমে পড়াই ভাল মনে করলাম।' (তাবারী ১/১১১)

رَجِيْم শব্দের অর্থ

رَجِيْم শব্দটি فَعِيْل এর ওজনে اِسم مَفْعُوْل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে মারদুদ বা বিতাড়িত। অর্থাৎ প্রত্যেক মঙ্গল হতে সে দূরে আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ৫)

إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ. لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র রাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শাইতান হতে। ফলে তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু

শ্রবণ করতে পারেনা এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৬-১০) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّٰهَا لِلنَّٰظِرِينَ. وَحَفِظْنَٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ. إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ

আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত, দর্শকদের জন্য। প্রত্যেক অভিশপ্ত শাইতান হতে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি। আর কেহ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৬-১৮)

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ কি সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

অতীব মেহেরবান পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

সকল সাহাবী (রাঃ) আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদকে বিসমিল্লাহর দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা ‘নামল’ এর এটি একটি আয়াত। তবে এটি প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে একটি পৃথক আয়াত কিনা, অথবা প্রত্যেক সূরার একটি আয়াতের অংশ বিশেষ কিনা, কিংবা এটি কি শুধুমাত্র সূরা ফাতিহারই আয়াত, অন্য সূরার নয়, কিংবা এক সূরাকে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্যই কি একে লিখা হয়েছে এবং এটি আদৌ আয়াত নয়, এ সব বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) আলী (রাঃ), ‘আতা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ) এবং যুহরীর (রহঃ) এটাই নীতি ও অভিমত যে, ‘বিসমিল্লাহ’ ‘সূরা বারাআত’ ছাড়া কুরআনের প্রত্যেক সূরারই একটা পৃথক আয়াত। এসব সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈ (রহঃ) ছাড়াও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (রহঃ), ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদের (রহঃ) একটি কাওলে এবং ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াহ (রহঃ) ও আবূ উবাইদ কাসিম ইব্‌ন সালামেরও (রহঃ) এটাই অভিমত। তবে ইমাম মালিক (রহঃ) এবং

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও তাঁদের সহচরগণ বলেন যে, 'বিসমিল্লাহ' সূরা ফাতিহারও আয়াত নয় বা অন্য কোন সূরারও আয়াত নয়।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করা প্রসঙ্গ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে নাকি নিম্নস্বরে এ নিয়েও মতভেদের অবকাশ রয়েছে। যারা একে সূরা ফাতিহার পৃথক একটি আয়াত মনে করেননা তারা একে নিম্নস্বরে পড়ার পক্ষপাতি। এখন অবশিষ্ট রইলেন শুধু ঐ সব লোক যারা বলেন যে, এটি প্রত্যেক সূরার প্রথম আয়াত। তাদের মধ্যেও আবার মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈর (রহঃ) অভিমত এই যে, সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য প্রত্যেক সূরার পূর্বে একে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন (রহঃ) এবং মুসলিমদের পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণের এটাই মাযহাব। সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে একে উচ্চস্বরে পড়ার পক্ষপাতি হলেন আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মু'আবিয়া (রাঃ), উমার (রাঃ), আবূ বাকর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)। আবূ বাকর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) হতেও গারীব বা দুর্বল সনদে ইমাম খতীব (রহঃ) এটা নকল করেছেন। বাইহাকী (রহঃ) ও ইব্‌ন আবদুল বার্ (রহঃ) উমার (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হতেও এটি বর্ণনা করেছেন। তাবেঈগণের মধ্যে সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবূ কালাবাহ্ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), আলী ইব্‌ন হাসান (রহঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রহঃ), 'আতা (রহঃ), তাঊস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সা'লিম (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব কারাজী (রহঃ), আবূ বাকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্‌র (রহঃ) ইব্‌ন হাযম, আবূ ওয়ায়েল (রহঃ), ইব্‌ন সীরীন (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রহঃ), আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রহঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ, ইব্‌ন উমারের (রাঃ) গোলাম নাফি, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ), উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহঃ), আরযাক ইব্‌ন কায়েস (রহঃ), হাবীব ইব্‌ন আবী সাবিত (রহঃ), আবূ শা'শা' (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল ইব্‌ন মাকরান (রহঃ), এবং বাইহাকীর বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন হানাফিয়্যাহ (রহঃ) এবং আবদুল বারের বর্ণনায় আমর ইব্‌ন দীনার (রহঃ)। এরা সবাই সালাতের যেখানে কিরা'আত উচ্চস্বরে পড়া হয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকেও উচ্চ শব্দে পড়তেন।

এর একটি প্রধান দলীল এই যে, এটি যখন সূরা ফাতিহারই একটি আয়াত তখন পূর্ণ সূরার ন্যায় একে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। তাছাড়া সুনান নাসাঈ, সহীহ

ইব্‌ন খুযাইমা, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, মুসতাদরাক হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সালাত আদায় করলেন এবং কিরা'আতে উচ্চ শব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন এবং সালাত শেষে বললেন ঃ 'তোমাদের সবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের সঙ্গে আমার সালাতেরই সামঞ্জস্য বেশী।' দারাকুতনী, খাতীব এবং বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (নাসাঈ ২/১৩৪, ইব্‌ন খুযাইমাহ ১/২৫১, ইব্‌ন হিব্বান ৩/১৪৩, হাকিম ১/২৩২,দারাকুতনী ১/৩০৫ এবং বাইহাকী ২/৪৬)

সহীহ বুখারীতে আছে যে, আনাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরা'আত কিরূপ ছিল?' তিনি বললেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক খাড়া শব্দকে লম্বা করে পড়তেন।' (ফাতহুল বারী ৮/৭০৯) তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন بِسْمِ اللّٰهِ কে মদ্ (লম্বা) করেছেন الرَّحْمٰنِ এর উপর মদ্ করেছেন ও رَحِيمِ এর উপর মদ্ করেছেন। মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাঊদ, সহীহ ইব্‌ন খুযাইমাহ এবং মুসতাদরাক হাকিমে উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আয়াত শেষে থামতেন এবং তাঁর কিরা'আত পৃথক পৃথক হত। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ পড়ে থামতেন, তারপর الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পড়তেন, পুনরায় থেমে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ পড়তেন। দারাকুতনী (রহঃ) এ হাদীসটিকে সঠিক বলেছেন। (আহমাদ ৬/৩০২, আবূ দাঊদ ৪/২৯৪, ইব্‌ন খুযাইমাহ ১/২৪৮, হাকিম২/২৩১, দারাকুতনী ১/৩০৭) ইমাম শাফিঈ (রহঃ) ও ইমাম হাকিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মু'আবিয়াহ (রাঃ) মাদীনায় সালাত আদায় করালেন এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়লেননা। সে সময় যেসব মুহাজির সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এতে আপত্তি জানালেন। সুতরাং তিনি পুনরায় যখন সালাত আদায় করানোর জন্য দাঁড়ালেন তখন উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করলেন। (হাকিম ১/২৩৩, মুসনাদ আশ শাফিঈ ১/৮০) প্রায় নিশ্চিতরূপেই উল্লিখিত সংখ্যক হাদীস এ মাযহাবের দলীলের জন্য যথেষ্ট। এখন বাকী থাকল তাঁদের বিপক্ষের হাদীস, বর্ণনা, সনদ, দুর্বলতা ইত্যাদি। ওগুলির জন্য অন্য জায়গা রয়েছে।

দ্বিতীয় মতামত এই যে, 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তে হবেনা। খলীফা চতুষ্টয়, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল, তাবেঈন ও পরবর্তী যুগের দলসমূহ হতে এটা সাব্যস্ত আছে। আবূ হানীফা (রহঃ), সাওরী (রহঃ) এবং আহমাদ ইব্‌ন হাম্বালের (রহঃ) এটাই মাযহাব। ইমাম মালিকের (রহঃ) মাযহাব এই যে, 'বিসমিল্লাহ' পড়তেই হবেনা, জোরেও নয়, আস্তেও নয়। তাঁর প্রথম দলীল তো সহীহ মুসলিমের আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি যাতে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতকে তাকবীর ও কিরা'আতকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা শুরু করতেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ 'আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) পিছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সবাই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা সালাত আরম্ভ করতেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, বিসমিল্লাহ পাঠ করতেননা। কিরা'আতের প্রথমেও না, শেষেও না। (ফাতহুল বারী ২/২৬৫, মুসলিম ১/২৯৯) সুনানে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। (তিরমিযী ২৪৪) এ হল ঐসব ইমামের 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার দলীল। এ প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, এ কোন বড় রকমের মতভেদ নয়। প্রত্যেক দলই অন্য দলের সালাতকে শুদ্ধ বলে থাকেন।

'বিসমিল্লাহ'র ফাযীলাত

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সোয়ারীর উপর তাঁর পিছনে যে সাহাবী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর বর্ণনাটি এই ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীটির কিছু পদস্খলন ঘটলে আমি বললাম যে শাইতানের সর্বনাশ হোক। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

তোমরা ইহা (অভিশপ্ত শাইতান) বলনা, কারণ এতে সে গর্বে বড় হয়ে যায়, এমনকি একটি বড় ঘর হয়ে যায়। বরং বিসমিল্লাহ বল, কারণ এতে শাইতান ছোট হতে হতে মাছির মত হয়ে যায়। (আহমাদ ৫/৫৯)

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' এর মধ্যে এবং ইব্‌ন মিরদুওয়াই (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সাহাবীর (রাঃ) নাম বলেছেন উসামা ইব্‌ন উমায়ের (রাঃ)। (নাসাঈ ৬/১৪২) আর তাতেই আছে ঃ এটা একমাত্র বিসমিল্লাহরই বারাকাত।'

প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে

প্রত্যেক কাজ ও কথার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। খুৎবার শুরুতেও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। হাদীসে আছে যে, বিসমিল্লাহ দ্বারা যে কাজ আরম্ভ করা না হয় তা কল্যাণহীন ও বারাকাতশূন্য থাকে। মুসনাদ আহমাদ এবং সুনানে রয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি অযূর সময় বিসমিল্লাহ বলেনা তার উযূ হয়না।' (আহমাদ ৩/৪১, আবূ দাঊদ ১/৭৫, তিরমিযী ১/১১৫, নাসাঈ ১/৬১, ইব্‌ন মাজাহ ১/১৪০) এ হাদীসটি হাসান বা উত্তম। কোন কোন আলেম তো উযূর সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। খাওয়ার সময়েও বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার ইব্‌ন আবী সালামাহকে (রাঃ) (যিনি তাঁর সহধর্মিনী উম্মে সালামাহর (রাঃ) পূর্ব স্বামীর পুত্র ছিলেন) বলেন ঃ

'বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খেতে থাক।' (মুসলিম ২/১৬০০) কোন কোন আলেম এ সময়েও বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা করলে যেন সে এটা পাঠ করে ঃ

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ' وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামের সঙ্গে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং যা আমাদেরকে দান করবেন তাকেও শাইতানের কবল হতে রক্ষা করুন।

তিনি আরও বলেন যে, এই মিলনের ফলে যদি সে গর্ভধারণ করে তাহলে শাইতান সেই সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। (ফাতহুল বারী ৯/১৩৬, মুসলিম ২/১০৫৮)

'আল্লাহ' শব্দের অর্থ

اَللَّهُ বারাকাত বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহান প্রভুর একটি বিশিষ্ট নাম। বলা হয় যে, এটাই اِسْمِ اَعْظَم কেননা সমুদয় উত্তম গুণের সঙ্গে এটাই গুণান্বিত হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে ঃ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২২-২৪)

এ আয়াতসমূহে 'আল্লাহ' ছাড়া অন্যান্য সবগুলিই গুণবাচক নাম এবং ওগুলি 'আল্লাহ' শব্দেরই বিশেষণ। সুতরাং মূল ও প্রকৃত নাম 'আল্লাহ'। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا

আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮০)

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। এক শতের একটা কম। যে ওগুলি গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ফাতহুল বারী ১১/২১৮, মুসলিম ৪/২০৬২) 'জামে'উত তিরমিযী ও সুনান ইব্‌ন মাজাহও নামগুলি এসেছে। (তিরমিযী ৯/৪৮০, ইব্‌ন মাজাহ ২/২১৬৯) ঐ দুই হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় শব্দের কিছু পার্থক্য আছে এবং সংখ্যায় কিছু কম-বেশি রয়েছে।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (আর রাহমানির রাহীম) এর অর্থ

اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ শব্দ দু'টিকে رَحْمَتْ থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে দু'টির মধ্যেই 'মুবালাগাহ' বা আধিক্য রয়েছে, তবে 'রাহীমের' চেয়ে 'রাহমানের' মধ্যে আধিক্য বেশি আছে। আল্লামা ইব্‌ন জারীরের (রহঃ) কথা অনুযায়ী জানা যায় যে, এতে প্রায় সবাই একমত। সহীহ তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

আমিই আর-রাহমান, আমি রাহেম সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকেই রাহেম নামের সৃষ্টি। অতএব যে এর হিফাযাত করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখি এবং যে ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (তিরমিযী ৬/৩৩)

ইতোপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাহমানের অর্থ হল দুনিয়া ও আখিরাতে দয়া প্রদর্শনকারী এবং রাহীমের অর্থ শুধু আখিরাতে রহমকারী। কেহ কেহ বলেন যে, رَحْمَن শব্দটি مُشْتَق নয়। কারণ যদি তা এ রকমই হত তাহলে مَرْحُوْم এর সঙ্গে মিলে যেত। অথচ কুরআনুল হাকীমের মধ্যে

وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৩) এসেছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই দু'টি নামই করুণা ও দয়া বিশিষ্ট। একের মধ্যে অন্যের তুলনায় দয়া ও করুণা বেশি আছে।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, রাহমানের অর্থ হল যিনি সমুদয় সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণা বর্ষণকারী। আর রাহীমের অর্থ হল যিনি মু'মিনদের উপর দয়া বর্ষণকারী। যেমন কুরআনুল হাকীমের নিম্নের দু'টি আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَـٰنُ

অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫৯) আল্লাহ বলেন ঃ

ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ

দয়াময় আরশে সমাসীন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫)

আল্লাহ সুবহানাহু বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর 'আর-রাহমান' নামসহ আরশে অবস্থান করছেন এবং তার সকল সৃষ্টিকে তাঁর দয়া ও রাহমাত ঘিরে রেখেছে। তিনি বলেন ঃ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا *'এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।* (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৩)

সুতরাং জানা গেল যে, رَحْمَن এর মধ্যে رَحِيْم এর তুলনায় مُبَالَغَة অনেক গুণ বেশি আছে। (কুরতুবী ১/১০৫) কিন্তু হাদীসের একটি দু'আর মধ্যে يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا এভাবেও এসেছে। 'রাহমান' নামটি আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত। তিনি ছাড়া আর কারও এ নাম হতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ রয়েছে ঃ

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০) অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৪৫) মুসাইলামা কায্যাব যখন নাবুওয়াতের দাবী করে এবং নিজেকে 'রাহমানুল ইয়ামামা' নামে অভিহিত করে, আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত করেন এবং চরম মিথ্যাবাদী নামে সে সারা দেশে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। আজও তাকে মুসাইলামা কায্যাব বলা হয় এবং প্রত্যেক মিথ্যা দাবীদারকে তার সাথে তুলনা করা হয়। আজ প্রত্যেক পল্লীবাসী ও শহরবাসী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ সবাই তাকে মিথ্যাবাদী বলে বিলক্ষণ চেনে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ

বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান করনা কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১১০)

মুসাইলামা কায্যাব এ জঘন্যতম স্পর্ধা দেখালেও সে সমূলে ধ্বংস হয়েছিল এবং তার ভ্রষ্ট সঙ্গীদের ছাড়া এটা অন্যের উপর চালু হয়নি। 'রাহীম' বিশেষণটির সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকেও বিশেষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ

তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে رَحِيْمٌ বলেছেন। এভাবেই তিনি স্বীয় কতগুলি নাম দ্বারা অন্যদেরকেও স্মরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٖ نَّبۡتَلِيهِ فَجَعَلۡنَٰهُ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (সূরা ইনসান/দাহ্‌র, ৭৬ ঃ ২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে سَمِيْعٌ ও بَصِيْرٌ বলেছেন। মোট কথা এই যে, আল্লাহর কতগুলি নাম এমন রয়েছে যেগুলির প্রয়োগ ও ব্যবহার অন্য অর্থে অন্যের উপরও হতে পারে এবং কতগুলি নাম আবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর ব্যবহৃত হতেই পারেনা। যেমন আল্লাহ, রাহমান, খালেক, রাযেক ইত্যাদি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রথম নাম নিয়েছেন 'আল্লাহ', অতঃপর ওর বিশেষণ রূপে 'রাহমান' এনেছেন। কেননা 'রাহীমের' তুলনায় এর বিশেষত্ব ও প্রসিদ্ধি অনেক গুণে বেশী। আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট নাম নিয়েছেন, কেননা নিয়ম রয়েছে সর্বপ্রথম সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নাম নেয়া।

রাহমান ও রাহীম শুধু আল্লাহ তা'আলারই নাম। ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এ কথাটি নকল করেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করার পূর্বে কুরাইশ কাফিরেরা রাহমানের সঙ্গে পরিচিতিই ছিলনা।

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَـٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তাদের ধারণা খণ্ডন করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখ।' কাফির কুরাইশরা তখন বলেছিল আমরা রাহমান ও রাহীমকে চিনিনা। সহীহ বুখারীতে এ বর্ণনাটি রয়েছে।

উম্মে সালমার (রাঃ) হাদীসটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক আয়াতে থামতেন এবং এভাবেই একটা দল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের উপর আয়াত করে তাকে আলাদাভাবে তিলাওয়াত করে থাকেন। আবার কেহ কেহ মিলিয়েও পড়েন।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব।	١. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

حمد শব্দের অর্থ

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহর জন্য, তিনি ছাড়া আর কেহ এর যোগ্য নয়, তা সে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে কেহ হোক না কেন। কেননা সমুদয় দান যা আমরা গণনা করতে পারিনা এবং তার মালিক ছাড়া কারও সেই সংখ্যা জানা নেই, সবই তাঁর কাছ থেকেই আগত। তিনিই তাঁর আনুগত্যের সমুদয় মালমসলা আমাদেরকে দান করেছেন। আমরা যেন তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে পারি সেজন্য তিনি আমাদেরকে শারীরিক সমুদয় নি'আমাত দান করেছেন। অতঃপর ইহলৌকিক অসংখ্য নি'আমাত এবং জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আমাদের অধিকার ছাড়াই তিনি

আমাদের নিকট না চাইতেই পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সদা বিরাজমান অনুকম্পা এবং তাঁর প্রস্তুতকৃত পবিত্র সুখের স্থান, সেই অবিনশ্বর জান্নাত আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি তাও তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এসবের যিনি মালিক, প্রথম ও শেষ সমুদয় কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য। (তাবারী ১/১৩৫) এটা একটি প্রশংসামূলক বাক্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গেই তিনি যেন বলে দিলেন ঃ তোমরা বল اَلْحَمْدُ لِلَّه অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।' কেহ কেহ বলেন যে, 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম ও বড় বড় গুণাবলীর দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা হয়। (তাবারী ১/১৩৭)

'হাম্‌দ' ও 'শোক্‌র' এর মধ্যে পার্থক্য

আরাবী ভাষায় যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাঁরা এ বিষয়ে এক মত যে, شُكْر এর স্থলে حَمْد ও حَمْد এর স্থলে شُكْر ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কথা হল اَلْحَمْدُ لِلَّه

'হাম্‌দ' শব্দের তাফসীর ও সালাফগণের অভিমত

উমার (রাঃ) একবার বলেছিলেন ঃ سُبْحَانَ اللَّه ও لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, اَللَّهُ اَكْبَرْ কে আমরা জানি, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلَّه এর ভাবার্থ কি?' আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা এ কথাটিকে নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। (তাবারী ১/১৫) এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা বললে আল্লাহকে খুবই ভাল লাগে।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। (তাবারী ১/১৩)

'আল-হাম্‌দ' শব্দের ফাযীলাত

আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করেন ঃ 'আমি মহান আল্লাহর প্রশংসামূলক কয়েকটি কবিতা রচনা করেছি। অনুমতি পেলে শুনিয়ে দিব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ

করেন।' (আহমাদ ৩/৪৩৫, নাসাঈ ৪/৪১৬) মুসনাদ আহমাদ, সুনান নাসাঈ, জামে'উত তিরমিযী এবং সুনান ইব্‌ন মাজাহ্‌য় যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম প্রার্থনা হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ।' (তিরমিযী ৯/৩২৪, নাসাঈ ৬/২০৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটিকে পরিভাষা অনুযায়ী 'হাসান গারীব' বলেছেন। সুনান ইব্‌ন মাজাহ্‌য় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কিছু দান করার পর যদি সে তার জন্য 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে তাহলে তার প্রদত্ত বস্তুই গৃহিত বস্তু হতে উত্তম হবে।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৫০)

সুনান ইব্‌ন মাজাহয় ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করল ঃ

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ.

হে আমার রাব্ব! তোমার বিশাল ক্ষমতা এবং মহান সত্ত্বার মর্যাদানুসারে তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

এতে মালাইকা সাওয়াব লিখার ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা আল্লাহ সুবহানুর নিকট আরয করলেন ঃ আপনার এক বান্দা এমন একটি কালেমা পাঠ করেছে যার সাওয়াব আমরা কি লিখব বুঝতে পারছিনা।' বিশ্বপ্রভু সব কিছু জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সে কী কথা বলেছে?' তাঁরা বললেন যে, সে এই কালেমা বলেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ 'সে যা বলেছে তোমরা হুবহু তাই লিখে নাও। আমি তার সাথে সাক্ষাতের সময়ে নিজেই তার যোগ্য প্রতিদান দিব।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/১২৪৯)

'হাম্‌দ' শব্দের পূর্বে 'আল' শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব

'আল হামদু'র আলিফ লাম 'ইসতিগরাকের' জন্য ব্যবহৃত অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের 'হামদ' বা স্তুতিবাদ একমাত্র আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ.

'হে আল্লাহ! সমুদয় প্রশংসা তোমারই জন্য, সারা দেশ তোমারই, তোমারই হাতে সামগ্রিক মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং সমস্ত কিছু তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।' (আত তাগরীব ওয়াত তাহরীব ২/২৫৩)

'রাব্ব' শব্দের অর্থ

সর্বময় কর্তাকে 'রাব্ব' বলা হয় এবং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং সঠিকভাবে সজ্জিত ও সংশোধনকারী। এসব অর্থ হিসাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য এ পবিত্র নামটিই শোভনীয় হয়েছে। 'রাব্ব' শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ব্যবহৃত হতে পারেনা। তবে সম্বন্ধ পদ রূপে ব্যবহৃত হলে সে অন্য কথা। যেমন رَبُّ الدَّارِ বা গৃহস্বামী ইত্যাদি। বলা হয়েছে যে, রাব্ব হল আল্লাহর মহান নামসমূহের অন্যতম নাম।

'আলামীন' শব্দের অর্থ

عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ শব্দের বহু বচন। আল্লাহ ছাড়া সমুদয় সৃষ্টবস্তুকে عَالَم বলা হয়। عَالَم শব্দটিও বহু বচন এবং এ শব্দের এক বচনই হয়না। আকাশের সৃষ্টজীব এবং পানি ও স্থলের সৃষ্টজীবকেও عَوَالِم অর্থাৎ কয়েকটি عَالَم বলা হয়। অনুরূপভাবে এক একটি যুগ-কাল ও এক একটি সময়কেও عَالَم বলা হয়।

ফার্রা (রহঃ) ও আবূ উবাইদার (রহঃ) মতে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন প্রাণীকে 'আলাম বলা হয়। দানব, মানব ও শাইতানকে 'আলাম বলা হবে। জন্তুকে 'আলাম বলা হবেনা। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং আবূ মুহাইসীন (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই 'আলাম বলা হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক শ্রেণীকে একটা 'আলাম বলা হয়।

জায্‌যায (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহজগত ও পরজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই 'আলাম। কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, এ মতটিই সত্য। কেননা এর মধ্যে সমস্ত 'আলামাই জড়িত রয়েছে। যেমন

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ. قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۖ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ

ফির'আউন বলল ঃ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? মূসা বলল ঃ তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২৩-২৪)

সৃষ্টবস্তুকে 'আলাম' বলার কারণ

عَلم শব্দটি **عَلاَمَت** শব্দ হতে নেয়া হয়েছে। কেননা 'আলাম সৃষ্ট বস্তু তার সৃষ্টিকারীর অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে এবং তাঁর একাত্মবাদের চিহ্নরূপে কাজ করে থাকে। (কুরতুবী ১/১৩৯)

২। যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়।	٢. ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

এর তাফসীর পূর্বেই করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির আর কোন প্রয়োজন নেই। কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ **رَبِّ الْعَلَمِيْنَ** এর বিশেষণের পর **اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْم** নামক বিশেষণটি ভয় প্রদর্শনের পর আশা ভরসার উদ্রেক কল্পে আনয়ন করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلۡعَذَابُ ٱلۡأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০) (কুরতুবী ১/১৩৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ.

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৬৫)

'রাব্ব' শব্দটির মধ্যে ভয় প্রদর্শন রয়েছে এবং 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ দু'টির মধ্যে আশা ভরসা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'যদি ঈমানদারগণ আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর ভীষণ শাস্তি সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হত তাহলে তাদের অন্তর হতে জান্নাতের নন্দন কাননের লোভ লালসা সরে যেত এবং কাফিরেরা যদি আল্লাহ তা'আলার দান ও দয়া দাক্ষিণ্য সম্পর্কে

পূর্ণ জ্ঞান রাখত তাহলে তারা কখনও নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতনা।' (মুসলিম ৪/২১০৯)

৩। যিনি বিচার দিনের মালিক।	٣. مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ

বিচার দিনে আল্লাহই একক ক্ষমতার মালিক

মহান আল্লাহর এ উক্তি অনুসারে কিয়ামাত দিবসের সঙ্গে তাঁর অধিকারকে নির্দিষ্ট করার অর্থ এই নয় যে, কিয়ামাত ছাড়া অন্যান্য জিনিসের অধিকারী হতে তিনি অস্বীকার করছেন, কেননা ইতোপূর্বে তিনি স্বীয় বিশেষণ 'রাব্বুল আলামীন' রূপে বর্ণনা করেছেন এবং ওর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই জড়িত রয়েছে। কিয়ামাত দিবসের সঙ্গে অধিকারকে নির্দিষ্টকরণের কারণ এই যে, সেই দিন তো আর কেহ সার্বিক অধিকারের দাবীদারই হবেনা। বরং সেই প্রকৃত অধিকারী আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেহ মুখ পর্যন্ত খুলতে পারবেনা। এমনকি টুঁ শব্দটিও করতে পারবেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ صَفّٗاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَقَالَ صَوَابٗا

সেদিন রুহ্ ও মালাইকা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবেনা এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৩৮) অন্য এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا

দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০৯) তিনি আরও বলেন ঃ

يَوۡمَ يَأۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ فَمِنۡهُمۡ شَقِيّٞ وَسَعِيدٞ

যখন সেই দিন (কিয়ামাত) আসবে তখন কোন ব্যক্তি আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবেনা, অনন্তর তাদের মধ্যে কতক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০৫)

‘ইয়াওমিদ্দীন’ এর অর্থ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ يَوْمِ الدِّيْنِ এর ভাবার্থ হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জীবের হিসাব দেয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যেদিন সমস্ত ভাল-মন্দ কাজের ন্যায্য ও চুলচেরা প্রতিদান দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ, যদি মহান আল্লাহ কোন কাজ নিজ গুণে মার্জনা করেন তাহলে তা হবে তাঁর ইচ্ছা ভিত্তিক কাজ। (ইব্‌ন আবী হাতিম ১/১৯) সাহাবা (রাঃ), তাবেঈন (রহঃ) এবং পূর্ব যুগীয় সৎ ব্যক্তিগণ হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক

কেননা মহান আল্লাহই সব কিছুরই প্রকৃত মালিক। যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ২৩)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এই মারফূ‘ হাদীসটি বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘ঐ ব্যক্তির নাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট যাকে শাহান শাহ বা রাজাধিরাজ বলা হয়। কারণ সব কিছুরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নেই।’ (ফাতহুল বারী ১/৬০৪, মুসলিম ৩/১৬৮৮) উক্ত সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে এসেছে ঃ

‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সেদিন সমগ্র যমীনকে স্বীয় মুষ্ঠির মধ্যে গ্রহণ করবেন এবং আকাশ তাঁর ডান হাতে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে জড়িয়ে থাকবে, অতঃপর তিনি বলবেন ঃ ‘আমি আজ প্রকৃত বাদশাহ, যমীনের সেই প্রতাপশালী বাদশাহরা কোথায় গেল? কোথায় রয়েছে সেই মদমত্ত অহংকারীরা?’ (ফাতহুল বারী ১৩/৪০৪, মুসলিম ৪/২১৪৮) কুরআন কারীমে আরও রয়েছে ঃ

لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ

যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ ঃ ১৬) অন্যকে তাই শুধু রূপক অর্থে মালিক বলা হয়েছে। ঃ কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজা রূপে নির্বাচিত করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৭) এখানে তালুতকে মালিক বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ *কারণ তাদের সামনে ছিল এক রাজা।* (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৭৯) কুরআন মাজীদের একটি আয়াতে আছে ঃ

إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا

তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নাবী সৃষ্টি করেছেন, রাজ্যাধিপতি করেছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২০) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে একটি হাদীসে আছে ঃ مِثْلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الأَسِرَّةِ 'সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহদের ন্যায়।' (ফাতহুল বারী ৬/৮৯, মুসলিম ৩/১৫১৮)

'দীন' শব্দের অর্থ

دِيْن শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদান, প্রতিফল এবং হিসাব নিকাশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমে বলেন ঃ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ

সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্ত প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ২৫) পবিত্র কুরআনের অন্য জায়গায় আছে ঃ أَئِنَّا لَمَدِينُونَ

আমাদেরকে কি প্রতিফল দেয়া হবে? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৫৩) হাদীসে আছে ঃ বিজ্ঞ সেই ব্যক্তি যে নিজেই নিজের কাছে প্রতিদান নেয় এবং এমন কার্যাবলী সম্পাদন করে যা অবধারিত মৃত্যুর পরে কাজে লাগে।' (ইব্‌ন মাজাহ ২/১৪২৩) অর্থাৎ নিজের আত্মার কাছে নিজেই হিসাব নিকাশ নিয়ে থাকে। যেমন ফারুকে আযম (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের হিসাব নিকাশ গৃহীত হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ কর এবং তোমাদের কার্যাবলী দাঁড়ি পাল্লায় ওযন হওয়ার পূর্বে তোমরা নিজেরাই ওযন কর এবং তোমরা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সেই বড় উপস্থিতির জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেদিন তোমাদের কোন কাজ গোপন থাকবেনা।' যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৮)

৪। আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি।	٤. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'ইবাদাত' শব্দের ধর্মীয় তত্ত্ব

'ইবাদাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সার্বিক অপমান ও নীচতা। যেমন 'তারীকে মোয়াব্বাদ' সাধারণ ঐ পথকে বলে যা সবচেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ রকমই بَعِيْرٌ مُعَبَّدٌ ঐ উটকে বলা হয় যা হীনতা ও দুর্বলতার চরম সীমায় পদার্পণ করে। শারীয়াতের পরিভাষায় প্রেম, বিনয়, নম্রতা এবং ভীতির সমষ্টির নাম 'ইবাদাত'।

কিছু করার পূর্বে আল্লাহর উপর নির্ভর করার উপকারিতা

চতুর্থ আয়াতটির অর্থ এ দাঁড়ায় ঃ 'আমরা আপনার ছাড়া আর কারও ইবাদাত করিনা এবং আপনার ছাড়া আর কারও উপর নির্ভর করিনা।' আর এটাই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস। সালাফে সালেহীন বা পূর্বযুগীয় প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞজনদের কেহ কেহ এ মত পোষণ করেন যে, সম্পূর্ণ কুরআনের গোপন তথ্য রয়েছে সূরা ফাতিহার মধ্যে এবং এ পূর্ণ সূরাটির গোপন তথ্য إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এই আয়াতটিতে রয়েছে ঃ

আয়াতটির প্রথমাংশে রয়েছে শির্কের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে স্বীয় ক্ষমতার উপর অনাস্থা ও মহাশক্তিশালী আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা। এ সম্পর্কীয় আরও বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর, আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার রাব্ব অনবহিত নন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মূল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্‌যাম্মিল,৭৩ ঃ ৯)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এই আয়াতেও এই বিষয়টিই রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে সম্মুখস্ত কেহকে লক্ষ্য করে সম্বোধন ছিলনা। কিন্তু এ আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এতে বেশ সুন্দর পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করল তখন সে যেন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর সম্মুখে হাযির হয়ে গেল। এখন সে মালিককে সম্বোধন করে স্বীয় দীনতা, হীনতা ও দারিদ্রতা প্রকাশ করল এবং বলতে লাগল ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তো আপনার হীন ও দুর্বল দাস মাত্র এবং আমরা সব কাজে, সর্বাবস্থায় ও সাধনায় একমাত্র আপনারই মুখাপেক্ষী। এ আয়াতে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী সমস্ত বাক্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ খবর দেয়া হয়েছিল।

সূরা ফাতিহা আল্লাহর প্রশংসা শিক্ষা দেয়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উত্তম গুণাবলীর জন্য নিজের প্রশংসা নিজেই করেছিলেন এবং বান্দাদেরকে ঐ শব্দগুলি দিয়েই তাঁর প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্যই যে ব্যক্তি এ সূরাটি জানা সত্ত্বেও সালাতে তা পাঠ করেনা তার সালাত হয়না। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে উবাদাহ ইব্‌ন সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ঐ ব্যক্তির সালাতকে সালাত বলা যায়না যে সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনা।' (ফাতহুল বারী ২/২৭৬, মুসলিম ১/২৯৫) সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি সালাতকে আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে

অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিয়েছি। অর্ধেক অংশ আমার ও বাকী অর্ধেক অংশ আমার বান্দার। বান্দা যা চাবে তাকে তাই দেয়া হবে।

বান্দা যখন اَلْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে, তখন আল্লাহ বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' বান্দা যখন বলে الرَّحْمـــنِ الرَّحِيمِ তখন তিনি বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার গুণগান করল।' যখন সে বলে مَـــلِكِ يَوْمِ الدِّينِ তখন তিনি বলেন ঃ 'আমার বান্দা আমার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করল।' সে যখন বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যেকার কথা এবং আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চাবে।' অতঃপর বান্দা যখন اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'এ সবই তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাবে তার জন্য তাই রয়েছে।' (মুসলিম ১/২৯৭)

তাওহীদ আল উলুহিয়া

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমরা বিশেষভাবে একাত্মবাদে বিশ্বাসী, আমরা ভয় করি এবং মহান সত্ত্বায় সকল সময়ে আশা রাখি। আপনি ছাড়া আর কারও আমরা ইবাদাতও করিনা, কেহকে ভয়ও করিনা এবং কারও উপর আশাও রাখিনা।' আর وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এর তাৎপর্য ও ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'আমরা আপনার পূর্ণ আনুগত্য বরণ করি ও আমাদের সকল কাজে একমাত্র আপনারই কাছে সহায়তা প্রার্থনা করি।

তাওহীদ আর রুবুবিয়াহ

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ 'এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা কর এবং তোমাদের সকল কাজে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর।' إِيَّاكَ نَعْبُدُকে পূর্বে আনার কারণ এই যে, ইবাদাতই হচ্ছে মূল ঈপ্সিত বিষয়, আর সাহায্য চাওয়া ইবাদাতেরই মাধ্যম ও

ব্যবস্থা। আর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পূর্বে বর্ণনা করা এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পরে বর্ণনা করা। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেছেন 'দাস'

যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বড় বড় দানের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই শুধু তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম عَبْد বা দাস নিয়েছেন। বড় বড় নি'আমাত যেমন কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করা, সালাতে দাঁড়ানো, মিরাজ করানো ইত্যাদি। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১) আরও বলেন ঃ

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ

আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল। (সূরা জিন,৭২ ঃ ১৯) অন্যত্র বলেন ঃ

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। (সূরা ইসরাহ, ১৭ ঃ ১)

বিপদাপদে আল্লাহর কাছে সাজদাবনত হতে হবে

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ 'হে নাবী! বিরুদ্ধবাদীদের অবিশ্বাসের ফলে যখন তোমার মন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন তুমি আমার ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে যাও।' তাই নির্দেশ হচ্ছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ. وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ.

আমি তো জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর

এবং সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯৭-৯৯)

৫। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।	٥. ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ

প্রশংসামূলক বাক্য আগে উল্লেখ করার কারণ

যেহেতু বান্দা প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, সেহেতু এখন তার কর্তব্য হবে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। যেমন পূর্বেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা চাবে তা সে পাবে।'

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, اهدنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর মধ্যে কি পরিমাণ সূক্ষ্মতা ও প্রকৃষ্টতা রয়েছে! প্রথমে বিশ্বপ্রভুর যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান, অতঃপর নিজের ও মুসলিম ভাইদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আকুল প্রার্থনা। প্রার্থিত বস্তু লাভের এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা। এ উত্তম পন্থা নিজে পছন্দ করেই মহান আল্লাহ এ পন্থা স্বীয় বান্দাদের বাতলে দিলেন। কখনও কখনও প্রার্থনার সময় প্রার্থী স্বীয় অবস্থা ও প্রয়োজন প্রকাশ করে থাকে। যেমন মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৪) ইউনুস (আঃ) দু'আ করার সময় বলেছিলেন ঃ

لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমা লংঘনকারী। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৮৭) কোন কোন প্রার্থনায় প্রার্থী শুধুমাত্র প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেই নীরব থাকে।

সূরায় হিদায়াত শব্দের বিশ্লেষণ

এখানে হিদায়াতের অর্থ ইরশাদ ও তাওফীক অর্থাৎ সুপথ প্রদর্শন ও সক্ষমতা প্রদান। ' অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

এবং আমি তাদেরকে দু'টি পথ দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ, ৯০ ঃ ১০) কখনও 'হিদায়াত' শব্দটি اِلَى এর সঙ্গে مُتَعَدِّىْ বা সকর্মক ক্রিয়া হয়ে থাকে। যেমন বলেন ঃ

ٱجْتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২১) এবং অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ

তাদেরকে ত্বারিত কর জাহান্নামের পথে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ২৩) এখানে হিদায়াতের অর্থ পথ প্রদর্শন ও রাস্তা বাতলে দেয়া। এইরূপ ঘোষণা রয়েছে ঃ

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তুমি তো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ। (সূরা শূরা, ৪২ ঃ ৫২) জিন বা দানবের কথা কুরআন মাজীদে রয়েছে ঃ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৪৩) (অর্থাৎ অনুগ্রহ পূর্বক সৎপথে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন)

'সিরাতাল মুস্তাকীম' এর বিশ্লেষণ

صِرَاطَ الْمُستَقِيمَ এর কয়েকটি অর্থ আছে। ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন তাবারী বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট, সরল ও পরিষ্কার রাস্তা যার কোন জায়গা বা কোন অংশই বাঁকা নয়। এ বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত যে, *সিরাতাল মুস্তাকীম* হল ঐ সরল-সঠিক পথ যার কোন শাখা-প্রশাখা নেই। উদাহরণ স্বরূপ, জারীর ইব্‌ন আতীয়া আল-খাতাফীর একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ বিশ্বাসীদের নেতা রয়েছেন সেই পথে যা সব সময়েই সরল-সঠিক এবং অন্যান্য পথে রয়েছে বক্রতা। তাবারী (রহঃ) বলেছেন, এ বিষয়ে অনেক উদাহরণ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আরাবরা *সিরাত* শব্দটি বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে

ব্যবহার করে থাকে, তা সৎ কাজের জন্য হোক অথবা অসৎ কাজের জন্য হোক। কিন্তু সৎ ব্যক্তির জন্য সঠিক এবং অসৎ ব্যক্তির বেলায় বক্র শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। কুরআনে যে সরল-সঠিক পথের কথা বলা হয়েছে তা হল ইসলাম। (তাবারী ১/১৭০)

মুসনাদ আহমাদে একটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'আল্লাহ তা'আলা صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। (তা এই যে) সীরাতে মুস্তাকীমের দুই দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে। তাতে কয়েকটি খোলা দরজা আছে। দরজাগুলির উপর পর্দা লটকানো রয়েছে। সীরাতে মুস্তাকীমের প্রবেশ দ্বারে সব সময়ের জন্য একজন আহ্বানকারী নিযুক্ত রয়েছে। সে বলছে ঃ 'হে জনমণ্ডলী! তোমরা সবাই এই সোজা পথ ধরে চলে যাও, আঁকা বাঁকা পথে যেওনা।' ঐ রাস্তার উপরে একজন আহ্বানকারী রয়েছে। যে কেহ এ দরজাগুলির কোন একটি খুলতে চাচ্ছে সে বলছে ঃ সাবধান, তা খুলনা, যদি খুলে ফেল তাহলে সোজা পথ থেকে সরে পড়বে।' সীরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে ইসলাম, প্রাচীরগুলি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ, প্রবেশ দ্বারে আহ্বানকারী হচ্ছে কুরআন কারীম এবং রাস্তার উপরের আহ্বানকারী হচ্ছে আল্লাহর ভয় যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপদেষ্টা রূপে অবস্থান করে থাকে।' (আহমাদ ৪/১৮২) এ হাদীসটি মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিম, তাফসীর ইব্‌ন জারীর, জামে' তিরমিযী এবং সুনান নাসাঈতেও রয়েছে এবং এর ইসনাদ হাসান সহীহ। আল্লাহই এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে 'হক বা সত্য'। তাঁর এ কথাটিই সবচেয়ে ব্যাপক এবং এসব কথার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই।

মু'মিনরাই হিদায়াতের আবেদন জানায়

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, মু'মিনের তো পূর্বেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত লাভ হয়ে গেছে, সুতরাং সালাতে বা বাইরে হিদায়াত চাওয়ার আর প্রয়োজন কি? তাহলে সেই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে হিদায়াতের উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাওয়া। কেননা বান্দা প্রতিটি মুহূর্তে ও সর্বাবস্থায় প্রতিনিয়তই আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশাবাদী ও মুখাপেক্ষী। সে নিজে স্বীয় জীবনের লাভ ক্ষতির মালিক নয়। বরং নিশিদিন সে আল্লাহরই প্রত্যাশী ও মুখাপেক্ষী। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে শিখিয়েছেন যে, সে

যেন সর্বদা হিদায়াত প্রার্থনা করে এবং তার উপর সদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক চাইতে থাকে। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর দরজায় ভিক্ষুক করে নিয়েছেন। সে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার আকুল প্রার্থনা মঞ্জুর করার গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়েছেন। বিশেষ করে অসহায় ও মুহতাজ ব্যক্তি যখন দিনরাত আল্লাহকে ডাকতে থাকে এবং প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ তখন তার সেই আকুল প্রার্থনা কবূলের জিম্মাদার হয়ে যান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ

হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৬) এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া এমনই, যেমন হিদায়াত প্রাপ্তগণকে হিদায়াত চাওয়ার নির্দেশ দেয়া। এই দুই স্থানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে তার উপরে অটল, অনড় ও দ্বিধাহীনচিত্তে স্থির থাকা। আর এমন কার্যাবলী সদা সম্পাদন করা যা উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করে। দেখুন মহান আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাগণকে নিম্নের এ প্রার্থনা করারও নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেননা এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত প্রদানকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৮)

সুতরাং اهدنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ এর অর্থ দাঁড়ালো ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল ও সোজা পথের উপর অটল ও স্থির রাখুন এবং তা হতে আমাদেরকে দূরে অপসারিত করবেননা।'

৬। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন;	٦. صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৭। তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।	٧. غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

এর বর্ণনা পূর্বেই গত হয়েছে যে, বান্দার এ কথার উপর মহান আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য ঐ সব কিছুই রয়েছে যা সে চাবে।' এ আয়াতটি সীরাতে মুস্তাকীমের তাফসীর এবং ব্যাকারণবিদ বা নাহ্বীদের নিকট এটা 'সীরাতে মুস্তাকীম' হতে বদল হয়েছে এবং আতফ্ বায়ানও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। আর যারা আল্লাহর পুরস্কার লাভ করেছে তাদের বর্ণনা সূরা নিসার মধ্যে এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَـٰٓئِكَ رَفِيقًا. ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا

আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ এবং আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৯-৭০)

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ঐ সব মালাক/ফেরেশতা, নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎলোকের পথে পরিচালিত করুন যাদেরকে আপনি আপনার আনুগত্য ও ইবাদাতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন।'

বলা হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করুন, ঐ সব লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন, যারা হিদায়াত বা সুপথ প্রাপ্ত এবং অটল অবিচল ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত ছিলেন। যারা আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী ও নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে-বহুদূরে অবস্থানকারী ছিলেন। আর ঐ সব লোকের পথ হতে রক্ষা করুন যাদের উপর আপনার ধূমায়িত ক্রোধ ও অভিশাপ বর্ষিত

হয়েছে, যারা সত্যকে জেনে শুনেও তা থেকে দূরে সরে গেছে এবং পথভ্রষ্ট লোকদের পথ হতেও আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন যাদের সঠিক পথ সম্পর্কে কোন ধারণা ও জ্ঞানই নেই, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং তাদেরকে সরল, সঠিক সাওয়াবের পথ দেখানো হয়না।

ঈমানদারদের পন্থা তো এটাই যে, সত্যের জ্ঞানও থাকতে হবে এবং তার আমলও থাকতে হবে। ইয়াহুদীদের আমল নেই এবং খৃষ্টানদের জ্ঞান নেই। এ জন্যই ইয়াহুদীরা অভিশপ্ত হল এবং খৃষ্টানরা হল পথভ্রষ্ট। কেননা জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমল পরিত্যাগ করা লা'নত বা অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

যাদেরকে (ইয়াহুদীদেরকে) আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬০)

খৃষ্টানরা যদিও একটা জিনিসের ইচ্ছা করে, কিন্তু তার সঠিক পথ তারা পায়না। কেননা তাদের কর্মপন্থা ভুল এবং তারা সত্যের অনুসরণ হতে দূরে সরে পড়েছে। অভিশাপ ও পথভ্রষ্টতা এই দুই দলের তো রয়েছেই, কিন্তু ইয়াহুদীরা অভিশাপের অংশে একধাপ এগিয়ে রয়েছে। যেমন কুরআন কারীমে রয়েছে ঃ

قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

যারা (খৃষ্টানরা) অতীতে নিজেরা ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকেও ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৭৭)

এ কথার সমর্থনে বহু হাদীস ও বর্ণনা পেশ করা যেতে পারে। মুসনাদ আহমাদে আছে যে, আদী ইব্‌ন আবী হাতিম (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনাবাহিনী একদা আমার ফুফুকে এবং কতকগুলো লোককে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাযির করেন। আমার ফুফু তখন বলেন ঃ 'আমাকে দেখা-শোনা করার লোক দূরে সরে রয়েছে এবং আমি একজন অধিক বয়স্কা অচলা বৃদ্ধা। আমি কোন খিদমাতের যোগ্য নই। সুতরাং দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আল্লাহ আপনার উপরও দয়া করবেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'যে তোমার খবরাখবর নিয়ে থাকে সে ব্যক্তিটি কে?' তিনি বললেন ঃ 'আদী ইব্‌ন আবী হাতিম।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'সে কি ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এদিক ওদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে?' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে আর একটি লোক ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি আলীই (রাঃ) ছিলেন। তিনি আমার ফুফুকে বললেন ঃ 'যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাওয়ারীর প্রার্থনা কর।' আমার ফুফু তার কাছে প্রার্থনা জানালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করেন এবং তিনি সাওয়ারী পেয়ে যান। তিনি ওখান হতে মুক্তি লাভ করে সোজা আমার নিকট চলে আসেন এবং বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দানশীলতা তোমার পিতা হাতিমকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর কাছে একবার কেহ গেলে আর শূন্য হাতে ফিরে আসেনা।' এ কথা শুনে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হই। আমি দেখি যে, ছোট ছেলে ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে অবাধে যাতায়াত করছে এবং তিনি তাদের সাথে অকুণ্ঠচিত্তে অকৃত্রিমভাবে আলাপ আলোচনা করছেন। এ দেখে আমার বিশ্বাস হল যে, তিনি কাইসার ও কিসরার মত বিশাল রাজত্ব ও সম্মানের অভিলাষী নন। তিনি আমাকে দেখে বলেন ঃ 'আদী! *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* বলা হতে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহ উপাসনার যোগ্য আছে কি? *'আল্লাহু আকবার'* বলা হতে এখন তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? মহাসম্মানিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে বড় আর কেহ আছে কি?' (তাঁর এই কথাগুলি এবং তাঁর সরলতা ও অকৃত্রিমতা আমার উপর এমনভাবে দাগ কাটলো ও ক্রিয়াশীল হল যে) তৎক্ষণাত আমি ইসলাম কবূল করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল আনন্দে রক্তিমাভ বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি বললেন ঃ

'যারা (আল্লাহর) ক্রোধ অর্জন করেছে তারা হল ইয়াহুদী এবং যারা ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে তারা হল খৃষ্টান।' এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান গারীব বলেছেন। (আহমাদ ৪/৩৭৮, তিরমিযী ৮/২৮৯)

مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ইয়াহুদকে বুঝানো হয়েছে এবং **ضَالِّيْنَ** দ্বারা খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।' আরও একটি হাদীসে আছে যে, আদীর (রাঃ) প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তাফসীরই করেছিলেন। এ হাদীসের অনেক সনদ আছে এবং বিভিন্ন শব্দে সে সব বর্ণিত হয়েছে।

ইতিহাসের পুস্তকসমূহে বর্ণিত আছে যে, যায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়িল যখন খাঁটি ধর্মের অনুসন্ধানে স্বীয় বন্ধুবান্ধব ও সাথী-সঙ্গীসহ বেরিয়ে পড়েন এবং এদিক

ওদিক বিচরণের পর শেষে সিরিয়ায় এলেন। তখন ইয়াহুদীরা তাঁদেরকে বলল ঃ 'আল্লাহর অভিশাপের কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মে আসতেই পারবেননা।' তাঁরা উত্তরে বললেন ঃ 'তা হতে বাঁচার উদ্দেশেই তো আমরা সত্য ধর্মের অনুসন্ধানে বের হয়েছি, কাজেই কিরূপে তা গ্রহণ করতে পারি?' তাঁরা খৃষ্টানদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা বলল ঃ 'আল্লাহ তা'আলার লা'নত ও অসন্তুষ্টির কিছু অংশ না নেয়া পর্যন্ত আপনারা আমাদের ধর্মেও আসতে পারবেননা।'

তাঁরা বললেন ঃ 'আমরা এটাও করতে পারিনা।' তারপর যায়িদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফাইল স্বাভাবিক ধর্মের উপরই রয়ে গেলেন। তিনি মূর্তি পূজা ও স্বগোত্রীয় ধর্মত্যাগ করলেন, কিন্তু ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম কোনক্রমেই গ্রহণ করলেননা। তবে তাঁর সঙ্গী সাথীরা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করল, কেননা ইয়াহুদীদের ধর্মের সঙ্গে এর অনেক মিল ছিল। যায়িদের ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অরাকা ইব্‌ন নাওফিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওতের যুগ পেয়েছিলেন এবং আল্লাহর হিদায়াত তাঁকে সুপথ প্রদর্শন করেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছিলেন ও সেই সময় পর্যন্ত যে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল তিনি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হউন।

সূরা ফাতিহার সার সংক্ষেপ

এই কল্যাণময় ও বারাকাতপূর্ণ সূরাটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সমষ্টি। এই সাতটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার যোগ্য প্রশংসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্র নামসমূহ এবং উচ্চতম বিশেষণের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই রোজ কিয়ামাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং বান্দাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, তারা যেন সেই মহান প্রভুর নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে যাঞ্চা করে, যেন তাঁর কাছে নিজের দারিদ্রতা ও অসহায়ত্বের কথা অকপটে স্বীকার করে, তাঁকে সব সময় অংশীবিহীন ও তুলনাবিহীন মনে করে, খাঁটি অন্তরে তাঁর ইবাদাত; তাঁর আহদানিয়াত বা একাত্মবাদে বিশ্বাস করে, তাঁর কাছে সরল সোজা পথ ও তার উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকার জন্য নিশিদিন আকুল প্রার্থনা জানায়। এই অবিসম্বাদিত পথই একদিন তাকে রোজ কিয়ামাতের পুলসিরাতও পার করাবে এবং নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ লোকদের পাশে জান্নাতুল ফিরদাউসের নন্দন কাননে স্থান দিবে। সাথে সাথে আলোচ্য সূরাটির মধ্যে যাবতীয় সৎকার্যাবলী সম্পাদনের প্রতি নিরন্তর উৎসাহ দেয়া হয়েছে যাতে কিয়ামাতের দিন বান্দা আত্মকৃত সাওয়াবসমূহ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া

মিথ্যা ও অন্যায় পথে চলার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে কিয়ামাত দিবসেও সে বাতিলপন্থীদের দল থেকে দূরে থাকতে পারে।

নি'আমাত হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে দান

ধীরস্থির ও সূক্ষ্মভাবে জাগ্রত মস্তিষ্ক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণনারীতি কি সুন্দর! আলোচ্য সূরায় أَنْعَمْتَ নামক বাক্যাংশে দানের ইসনাদ বা সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা হয়েছে এবং أَنْعَمْتَ বলা হয়েছে। কিন্তু غَضَب এর ইসনাদ করা হয়নি; বরং এখানে কর্তাকেই লোপ করা হয়েছে এবং مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলা হয়েছে। এখানে বিশ্ব প্রভুর মহান মর্যাদার প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে মূল কর্তা আল্লাহ তা'আলাই। যেমন অন্যস্থানে বলা হয়েছে ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে? (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ১৪) এরূপভাবেই ভ্রষ্টতার পরিণতি পথভ্রষ্টের দিকেই করা হয়েছে। অথচ অন্য এক জায়গায় আছে ঃ

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

আল্লাহ যাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সে সৎ পথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১৭) অন্যত্র আছে ঃ

مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৬) এ রকমই আরও বহু আয়াত রয়েছে যদ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পথ প্রদর্শনকারী ও পথ বিভ্রান্তকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।

কাদরিয়্যাহ দল, যারা কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াতকে দলীলরূপে গ্রহণ করে বলে থাকে যে, বান্দা তার ইচ্ছাধীন ও মুক্ত স্বাধীন, সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই সম্পাদন করে। কিন্তু তাদের এ কথা ভ্রমাত্মক ও প্রমাদপূর্ণ। এটা খণ্ডনের

জন্য ভূরি ভূরি স্পষ্ট আয়াতসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু বাতিল পন্থীদের এটাই রীতি যে, তারা স্পষ্ট আয়াতকে পরিহার করে অস্পষ্ট আয়াতের পিছনে লেগে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে আছে ঃ

'যখন তোমরা ঐ লোকদেরকে দেখ যারা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছনে লেগে থাকে তখন বুঝে নিবে যে, তারা ওরাই যাদের নাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন এবং স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক।' (ফাতহুল বারী ৮/৫৭) এ নির্দেশনামায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিত এই আয়াতের প্রতি রয়েছে ঃ

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ

অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশে অস্পষ্টের অনুসরণ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৭)

সুতরাং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, বিদ'আতীদের অনুকূলে কুরআনুল হাকীমের মধ্যে সঠিক ও অকাট্য দলীল একটিও নেই। কুরআন মাজীদের আগমন সূচিত হয়েছে সত্য ও মিথ্যা, হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই। বৈপরীত্য ও মতবিরোধের জন্য আসেনি বা তার অবকাশও এতে নেই। এতো মহাবিজ্ঞ ও প্রশংসিত আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ হয়েছে।

আমীন বলা প্রসঙ্গ

সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলা মুস্তাহাব। اَمِيْن শব্দটি يَاسِيْن শব্দটির মত এবং এটা اَمِيْن ও পড়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি কবূল করুন।' আমীন বলা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল হল ঐ হাদীসটি যা মুসনাদ আহমাদ, আবূ দাঊদ এবং তিরমিযীতে অ'য়েল ইব্‌ন হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ পড়ে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি স্বর দীর্ঘ করতেন।' (আহমাদ ৪/৩১৫, আবূ দাঊদ ১/৪৭৪, তিরমিযী ২/৬৭) সুনান আবূ দাঊদে আছে যে, তিনি স্বর উচ্চ করতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। আলী (রাঃ), ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ

হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বশব্দ আমীন তাঁর নিকটবর্তী প্রথম সারির লোকেরা স্পষ্টতঃই শুনতে পেতেন। (আবূ দাঊদ ১/৫৭৫) সুনান আবূ দাঊদ ও সুনান ইব্‌ন মাজাহয় এও আছে যে, 'আমীনের শব্দে মাসজিদ প্রতিধ্বনিত হয়ে বেজে উঠত।' (আবূ দাঊদ ১/৫৭৫, ইব্‌ন মাজাহ ১/২৭৯) ইমাম দারাকুতনীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন। আরও বর্ণিত আছে যে, বিলাল (রাঃ) বললেন ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাতে যোগ দেয়ার পূর্বে 'আমীন' বলা শেষ করবেননা।' (আবূ দাঊদ ১/৫৭৬, দারাকুতনী ১/৩৩৫) সালাতের বাইরে থাকলেও 'আমীন' বলতে হবে। তবে যে ব্যক্তি সালাতে থাকবে তার জন্য বেশি জোর দেয়া হয়েছে। সালাত আদায়কারী একাকী হোক বা মুক্তাদী হোক বা ইমাম হোক, সর্বাবস্থায় তাকে আমীন বলতেই হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'তোমাদের কেহ যদি সালাতে 'আমীন' বলে, তা যদি মালাইকার আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ১১/২০৩, মুসলিম ১/৩০৭) সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ইমাম যখন আমীন বলেন এবং অন্যরাও আমীন বলে তখন মালাইকার আমীন বলার সাথে যাদের আমীন বলা মিলে যাবে তাদের পিছনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (মুসলিম ১/৩০৭) এর ভাবার্থ এই যে, তার 'আমীন' ও মালাইকার 'আমীন' বলার সময় একই হয় বা কবূল হওয়া হিসাবে অনুরূপ হয় অথবা আন্ত রিকতায় অনুরূপ হয়। সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে মারফূ রূপে বর্ণিত আছে ঃ 'ইমাম যখন وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলেন তখন তোমরা 'আমীন' বল, আল্লাহ দু'আ কবূল করবেন।' (মুসলিম ১/৩০৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ 'আমাদের আশা ভঙ্গ করবেননা।' অধিকাংশ আলেম বলেন যে, এর অর্থ হল ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রার্থনা কবূল করুন।'

মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইয়াহুদীদের আলোচনা হলে তিনি বলেন ঃ

'আমাদের তিনটি জিনিসের উপর ইয়াহুদীদের যতটা হিংসা বিদ্বেষ আছে ততটা হিংসা অন্য কোন কিছুর উপর নেই। (১) জুমু'আ, আল্লাহ আমাদেরকে

তার প্রতি হিদায়াত করেছেন ও পথ দেখিয়েছেন এবং তারা এ থেকে ভ্রষ্ট রয়েছে। (২) কিবলাহ এবং (৩) ইমামের পিছনে আমাদের আমীন বলা।' (আহমাদ ৬/১৩৪)

ইব্‌ন মাজাহর (রহঃ) হাদীসে রয়েছে ঃ 'সালাম' ও 'আমীন' ইয়াহুদীদের যতটা বিরক্তি উৎপাদন করে অন্য কোন জিনিস তা করেনা। (ইব্‌ন মাজাহ ২/২৭৮)

সূরা ফাতিহার তাফসীর সমাপ্ত।